বাংলাদেশের নাগরিক থিয়েটার

বিপ্লব বালা

বাংলাদেশের বর্তমানকার নাগরিক থিয়েটার 'মুক্তিযুদ্ধের ফসল' হিসেবে বিবেচিত। যুদ্ধফেরৎ মুক্তিযোদ্ধার একাংশ মঞ্চে নবনাট্যের সূচনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতায় দুটো শর্ত গৃহীত হয় ছাত্রদের লিখিত নতুন নাটক হতে হবে আর নির্দেশনা-অভিনয় হলের শিক্ষার্থীদের নিয়েই করতে হবে। তাতে অভিনব ঘটনা ঘটে। বেশিরভাগ নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেত্রী পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়া 'ব্যতিক্রমী', 'নিরীক্ষামূলক', 'অভিনব' সব নাট্যরূপায়ণ করেন। তাতে সেই সময়কার ছাত্র-যুবার অনির্দেশ্য সংকটযন্ত্রণা বিচিত্র পথে প্রকাশ মুক্তি খুঁজে নেয়। দর্শক তাতে আলোড়িত, রোমাঞ্চিত হয়। পত্র-পত্রিকা নিয়মিত নাট্যচর্চার আবেগসঞ্চার করে। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে অনিয়মিত শৌখিন নাট্যচর্চা হত পাড়ার ক্লাবের উদ্যোগে। ষাটের দশকে 'ড্রামা সার্কেল' বলে একটি গ্রুপ কেবল গোটাকয়েক ভিন্ন ভাবনা-রীতির প্রয়োজনা করেছিল—সেটা কোনো নিয়মিত ধারাপাত করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সংসদও কয়েকটি ভালো মানের প্রযোজনা করে। 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' গঠিত হলেও, মঞ্চে নয় টেলিভিশনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এদের অনেকের মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতার থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা ছিল। তারাই প্রথম মুক্ত স্বদেশে 'দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক দেখুন'—বলে নাট্যপ্রযোজনা শুরু করে।—তারপর একে একে গ্রুপ গঠিত হতে থাকে। নিয়মিত নাটকের সূচনা এভাবে ঘটে বাংলাদেশে।

পঞ্চাশের দশকে কলকাতা বহুরূপীর দুটি প্রযোজনা—'রক্তকরবী' ও 'ছেঁড়াতার' ঢাকার সাধারণ দর্শকের দেখা প্রথম অন্যধরনের থিয়েটার। তাতে তখনকার নাট্যোৎসাহীরা আলোড়িত হয়, নিজেরা তেমন নাটক করার নানা উদ্যোগ নিলেও, পরাধীন দেশের বাস্তবতায় তা করে উঠতে পারেননি। ১৯৭৪ সালে কলকাতার 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর দুটি নাটক 'রাজরক্ত' ও 'চাকভাঙ্গা মধু' বাংলা একাডেমীর এক অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়। নতুন ধরনের নাটকের একটা ধারণা তাতে মেলে।

পাকিস্তান আমলে জনা দুই/তিন বিদেশে নাট্যশিক্ষা করেন। তাঁরা দেশে ফিরে তার কিছু প্রয়োগও করেন—'ড্রামা সার্কেল' ও 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়'-এ।

এই হল মোটের উপর পূর্ব-অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের থিয়েটারের। এই পূর্ব-অভিজ্ঞতার স্বল্প পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু। নাটকের বিষয় অনির্দেশ্যভাবে খুঁজে নিচ্ছিল রীতি-প্রকরণের আধার। নবীন-অতিনবীন নাট্যকারদের মৌলিক নাটক আর বিদেশি অনুবাদ-রূপান্তর—এই দুই ধারায় চলছিল নাটক। তার মধ্যে ঢাকা থিয়েটার ও সেলিম আল দীন এর বিপরীতে এক তৃতীয় ধারার কথা বলেন—যদিও তার কোনো হদিশ সহজে মেলেনি—নানা বিদেশীয় নাটকের ছায়ায় তার সন্ধান চলছিল।—সংবাদ কার্টুন-শকুন্তলা-মুনতাসির ফ্যান্টাসিতে তা ধরা যায়। রাজনৈতিক রঙ্গব্যঙ্গ আর পুরাণের নবভাষ্য প্রদান—তাতে কোনো চারিত্র্য ঠিক পাওয়া যায় না। এছাড়া ভালো করে ভালো নাটক বা দেশ-বিদেশের ভালো নাটকের সন্ধান চাই, জাতীয়তাবাদী হুজুগ নয় অথবা নাটক হবে শ্রেণী-সংগ্রামের

সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার বলার আরেক মেজাজ—সবই মূলত বিষয়-ভাবনা, তবে রীতি-আঙ্গিক হিসেবে 'ব্যতিক্রমী', 'নিরীক্ষাধর্মী', 'আধুনিক'-এসব চলতি বুলি ছিল। অবশ্য কেবল বিষয় নয়, শিল্প-নন্দনের ভাবনার কথা ঢাকা থিয়েটার ও নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় প্রথম থেকে তুলেছিল। এর মধ্যে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় প্রতিবছর যেতে শুরু করে নাটোৎসুক শিক্ষার্থী—তারপরে তারা ফিরতেও থাকে। এর মধ্যে ঢাকা থিয়েটার অনুকারী উপনিবেশিক নাটকের বদলে বাংলা নাটকের নিজস্ব আঙ্গিক নির্মাণের ঘোষণা করে চলে।—বাংলা নাটকের ইতিহাসে দুশো বছরের নয়—হাজার বছরের দেশজ সে ধারা বর্ণনাত্মক পাঁচালি, ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সংলাপ-চরিত্র নির্ভর নয়।

এইসব ভাবনার নাট্যভাষা হল ঃ ঢাকা থিয়েটারের কিত্তনখোলা। ততদিনে জামিল আহমেদ এন.এস.ডি শেষ করে ফিরেছেন। তিনি এ নাটকের মঞ্চ কল্পনা প্রসেনিয়ামের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে খোলা এক মেলার আঙ্গিকে দেন—নাটকের দৃশ্য-প্রতিবেশ অনুসরণে। অবশ্য মঞ্চের নানা ব্যবহার তার আগেই শুরু হয়েছে—ফণীমনসা বা কোপের্নিকের ক্যাপ্টেন-এও।

তবে 'কিত্তনখোলা' নাট্যের গঠনশৈলী ভিন্ন ঃ গায়েনের গান সেখানে বর্ণনাত্মক মেজাজ আনে, চরিত্রবলীর সংলাপও বর্ণনাত্মক হয়ে ওঠে। মেলায় আগত বিচিত্র মানুষ আর যাত্রাদলের অভিনেত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং স্থানীয় ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—বৃহৎ এক সামাজিক প্রতিবেশ তৈরি করে। তার মধ্যে আস্ত এক মেলার গতায়াতে মঞ্চরূপায়ণ বিচিত্র গতিসম্পন্ন হয়—অভিনেত্রীদের যূথসঞ্চালনে—নানা ইডিয়মে, কম্পোজিশনে।

এন.এস.ডির শিক্ষার্থীরাই বাংলাদেশের থিয়েটারের খোলনলচে অনেকটা বদলে দেয়। মঞ্চসজ্জা ও তার ব্যবহার, অলোকবিন্যাস, পোশাকের বাস্তবতা ছেড়ে রঙের মনস্তত্ত্ব নির্ভর নানা থিয়েটারি কস্টিউম, গান-নাচের ব্যবহার—বিশেষ করে শারীরিক অভিনয়ের প্রয়োগ—প্রযোজনার পূর্ববর্তী ধীর-মধ্যলয়ের পুনরাবৃত্তি ভেঙে দেয়—বাড়তি গতি সঞ্চার করে। তবে তাতে চরিত্রাভিনয়, বিশেষত বাচিক অভিনয় নাট্যের ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিতে অপারগ হয়। সবটা তো এক অর্থে বাইরে থেকে ঘটিয়ে তোলা; বিষয় ও দর্শকের সঙ্গে সম্বন্ধপাতে হয়ে ওঠে নি; বরং এন.এস.ডিতে চর্চিত, একধরনের অবাঙালি নাট্যবাচনের বিবিধ প্রয়োগ বলা যায় একে। কেউ কেউ তো দিল্লির কোনো প্রযোজনার হুবহু অনুসরণ করেন। তাতে নতুন চমকে দর্শক বিস্মিত ও হতচকিত হয়। তার গয়ংগচ্ছ অভ্যেস তাতে কাটে যদিও—তবু কোথাও মঞ্চ উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে—দর্শকের সঙ্গে স্বাভাবিক বোঝাপড়া ও বিনিময় তাতে বিঘ্নিত হয়। প্রায় পাল্লা দিয়ে একের পর এক প্রযোজনা, অভিনব রূপায়ণের প্রদর্শন হয়ে ওঠে! সেই ঘোর তার এখনও কাটেনি বুঝি, সচেতন চর্চায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে বরং।

১৯৭২-৭৩ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যরচনা করে সেলিম আল দীনের মঞ্চনাটকের সূচনা। তারপর ঢাকা থিয়েটার পত্তন করে তিনি আর নাসিরউদ্দিন বাচ্চু যুগ্ম এক নাট্যরচনা-রূপায়ণের যাত্রা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র সেলিম আল দীন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন। এখানেই তিনি নাট্যতত্ত্ব ও নাটক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পঠনকালে

তিনি লক্ষ্য করেন, বাংলা কাব্য হিসেবে পঠিত তাবৎ বিবিধ পদাবলী ও আখ্যানকাব্যসমূহ মূলত গেয়, অভিনয়, পরিবেশিত হ'ত। এই সূত্র ধরে তিনি 'মধ্যযুগের বাংলা নাটক' বলে এক অভিনব গবেষণা-গ্রন্থ পিএইচডি সন্দর্ভ হিসেবে প্রণয়ন করেন। এখানে তিনি চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তন ও নানা আখ্যান পালা-যাত্রা পরিবেশনা, মঙ্গলকাব্যসমূহ, মৈমনসিংহগীতিকা, ধর্মীয়-ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক আখ্যানসমূহ, পুঁথি-পয়ার-পাঁচালি-নাটকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে ঘোষণা করেন—এসবই বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাস—মূলত বর্ণনাত্মক পাঁচালি রীতিতে পরিবেশিত বাংলা নাটকের আবহমান মূলধারা—যা সংলাপ-চরিত্র নির্ভর পাশ্চাত্য নাটকে থেকে মূলত ভিন্ন চারিত্র্যে নিজস্ব; দেশজ নানা সেসকল নাট্যরীতি দেশজুড়ে এখনও চর্চিত, অভিনীত বাংলা নাটক। তিনি কেবল বাংলা নাটকের এই ইতিহাস উদ্‌ঘাটন-আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন না;—'কিত্তনখোলা' থেকে কেরামত মঙ্গল, হাতহদাই, বনপাংশুল, চাকা, যৈবতী কন্যার মন, প্রাচ্য নাটকের নানা সময়ে নানা নাম দেন—এপিক থিয়েটার, কথানাট্য, পাঁচালি রীতির বিবিধ বিচিত্র বাংলা নাটকের অনুসরণে একালের আধুনিক নাটক—যা স্বদেশীয়-বিদেশীয় নানা উৎসখাত থেকে সৃজনশীল মিশ্র মেলবন্ধন করে চলেন। তাতে তিনি আখ্যান-বিন্যাসে এপিক আঙ্গিক-প্রকরণ রচনা করেন—যা চরিত্রে, বিচারে মহাকাব্যিক—বর্ণনাত্মক পীতিতে চরিত্র সংলাপের এক অভিনব যুগলবন্দী হয়ে ওঠে। নাসিরউদ্দিন বাচ্চু অভিনব এই রচনাবলীর নানা নাটভাষ্য উদ্‌ঘাটন,রূপায়ণ করেন। তাদেরএই যৌথ যুগ্ম সৃজনকর্ম বাংলাদেশের থিয়েটারের এক অর্জন হিসেবে বিবেচিত। তবে এসব নাটকের বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা আধুনিক কবিতা ও গদ্যের জটিলতার সমকক্ষ—মঞ্চে যার শ্রুতিবাচন, দৃশ্যগত বিবিধ প্রকরণের দ্বৈততায় গুরুভার হয়ে ওঠে;—বাংলা পরিবেশনার শ্রুতিনির্ভর কাব্যসকল শ্রোতা-সাধারণের দীর্ঘ ঐতিহ্য নির্ভর সুপরিচিত; আর সেলিম আল দীনের নবপুরাণ-সুলভ আখ্যান দর্শক সাধারণের কোনো সাধারণ ভূমির অবচেতন-অচেতন তলে ভিত্তি ঠিক পায় না; এমনিতে নাগরিক দর্শক স্বদেশীয় আখ্যান-কাব্যের ভাব-ভাষার রীতির সঙ্গে বিদেশিতুল্য অপরিচিত—তারা সেলিম আলদীনের এই সৃজন উল্লম্ফে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে দৃশ্যকাব্যের, নাট্যবাচনের অভিনবত্ব ও রূপায়ণের মাহাত্ম্যে তারা অনাস্বাদিত এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা।

তবু দর্শকসাধারণ ও নাট্যজন বিস্মিত অভিনন্দনে এর সৃজন-সামর্থ্যে অভিভূত হয়। পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যজন, বিশেষত নাট্যকারের ওপর সেলিম আল দীনের রচনা সবিশেষ এক উত্তরাধিকারের মর্যাদা পায়—যা প্রায়শ অসম অনুসারীদলের ছেলেমানুষী হয়ে পড়ে—গলায় উত্তরীয় ঝুলিয়ে 'হে শ্রোতৃমণ্ডলী' বলে বর্ণনা-ব্যাখ্যান, আর থেকে থেকে সংলাপ-চরিত্রের পুনরাবৃত্ত এক গঠনশৈলীতে রচিত হয়ে চলে একের পর এক রচনা। আচার্যের এইসব অনুকারী একলব্যদল, কে কত খাঁটি অনুসারী তাই নিয়ে বিতণ্ডায় মাতে।—তবে দুই বাংলার প্রায় সকল নাট্যদলের ওপর সেলিম আল দীনের এই বাচন-ইডিয়াম নানা ধরনের অভিভাব তৈরি করেছে, পরিচিত প্রথাগত নাট্যরচনাধারার এক ভিন্ন ধারাপাত করেছে তা, একথা বুঝি বলা যায়।

এর পাশাপাশি নাম করতে হয় সৈয়দ শামসুল হকের। কবি, গল্পকার-ঔপন্যাসিক-প্রবন্ধকার হিসেবে গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে তিনি বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের প্রধান এক রূপকার। ৭৬ সালে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নামে

মুক্তিযুদ্ধের পটে রচিত তাঁর কাব্যনাট্য বাংলাদেশের নাটকের এক মর্যাদা সম্পন্ন করে। 'সব্যসাচী' অভিধাটি তাতে অনিবার্য হয়ে ওঠে তাঁর। এটি কোনো অঞ্চলের ভাষা না হয়েও এর প্রাকৃত শব্দাবলী, আধুনিক কাব্যের প্রকরণে অভিনব এই নাটক রচিত। কাব্যনাটকের প্রথাগত কাব্যিকতা তাতে নেই, গদ্যবাচন যেন বা কাব্যছন্দে ধ্রুপদী নাটকের চরিত্র পেয়েছে। এর পরে 'নূরল দীনের সারাজীবন' নাটক সামরিক শাসনের দুঃকালে ইতিহাসের বিস্মৃত এক গণ-নায়ককে ব্রিটিশ সংগ্রহশালা থেকে উদ্ধার ও বর্তমানে তাকে অন্বিত করে লক্ষ্যভেদী নান্দনিক আয়ুধ হয়ে উঠেছে—'জাগো বাহে কুনঠে সবায়' রংপুর অঞ্চলের এই আহ্বান যেন জয় বাংলার পুনরুদ্ধারের এক দিয়াশলাইকাঠি হয়ে ওঠে—যা বাঙালির এক চিরকালের শ্লোগান হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ-বিরোধী নির্যাতিত কৃষক নায়ক, একালের আরেক বিপুল জাগরণ-জয়ের বীরনায়কের ট্রাজিক পরিণতিতে হয়ে উঠেছেন তাঁর পূর্বসুরী—যেন বাঙালির সম্ভাবনা-সীমাবদ্ধতায় পুরাণ-প্রতিম। এতখানি চারিত্র্য বিশিষ্ট আর কোনো বাংলা নাটক সম্ভবত অর্জন করেনি। আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সাধুবাংলার বিদেশীয়বাচন অভিনব বিন্যাসে এই কাব্যনাটকে অন্বিত।

'ঈর্ষা'ও এক আশ্চর্য নাটক—তেরোটি সংলাপে, তিনটি চরিত্রের চিরকালের দুই বয়সের ঈর্ষাজাত প্রেম, একালের কাব্যভাষায় ঈর্ষণীয় বিষয়রীতিতে অভিনব প্রকরণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া শেক্সপীয়র অনুবাদ-কর্মে,—ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট ও হ্যামলেট—তাঁর কীর্তি যথা মর্যাদা-সম্পন্ন। ডফম্যানের নাটকের রূপান্তরণও একালের রাজনৈতিক সংকটের ভাষ্য এক—'মুখোশ'। 'গণনায়ক'-শেক্সপীয়র প্রণোদিত 'জুলিয়াস সিজার'—এর দুঃকাল ভাষ্য।

সব মিলিয়ে সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের থিয়েটারে বিবিধ মাত্রা সঞ্চার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন-সূত্রে বিশিষ্ট এক অভিভাব ঘটেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন আর মামুনুর রশীদ দেশজুড়ে মঞ্চায়িত নাট্যকার হিসেবে সময়ের প্রয়োজনে তাদের সীমাবদ্ধতাসহ ঐতিহাসিক দায়পালন করেন বাংলাদেশের থিয়েটারে। আঞ্চলিক ও নাগরিক ভাষার নানা প্রয়োগ তাঁরা করেছেন। 'সুবচন নির্বাচনে' আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত প্রথম দর্শক-গ্রাহ্য নাটক। তাঁর 'এখন দুঃসময়', 'এখনো ক্রীতদাস' এবং 'মেরাজ ফকিরের মা' সময়কে ধারণ করে। মামুনুর রশীদের 'ইবলিশ', 'ওরা কদম আলী', 'জয়জয়ন্তী' এবং 'রাঢ়াঙ'—বিশিষ্ট রচনা, যা বাংলাদেশের নাটকের আরেক চারিত্র্য নির্ধারণ করেছে—শ্রেণী সংগ্রাম নানা আঞ্চলিক ভাষায় বাঙ্ময় হয়েছে।

সবশেষে বলতে হয় সৈয়দ জামিল আহমেদের নাম। দিল্লির এন.এস.ডির এই স্নাতক বাংলাদেশের নাটকে মঞ্চকল্প-রচনা, দৃশ্যকাব্য-প্রকরণ রূপায়ণ-নির্দেশনা ও শিল্পসততায় বিপুল সঞ্চার করেছেন। প্রাথমিকপর্বে মঞ্চসৃজন ও আলোকপাত তিনি নাট্যের দৃশ্যকল্পের নানা নিরীক্ষা করেছেন—'কিত্তনখোলা', 'কেরামত মঙ্গল'এ—, 'চাকা' তো তাঁরই নির্দেশিত। তবে 'বিষাদসিন্ধু' নাট্যে তার সৃজনকল্পনা সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করেছে। এ নাটকের মঞ্চগঠন, দৃশ্যগত কম্পোজিশন, কোরিওগ্রাফি, পোশাকআশাক, আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির ব্যবহার—সবমিলে দুই পর্বে বিভক্ত এই মহাকাব্যিক আখ্যান যে দৃশ্যকাব্য সৃজন করে মঞ্চে—পিটার ব্রুকের 'মহাভারত' অনুপ্রাণিত বলে অনেক মনে করেন—নবীন-প্রবীণ তাবৎ নির্দেশক-রূপকার-অভিনেত্রীর ওপর তা স্থায়ী অভিভাব

সঞ্চার করে—তার অনুকারী অসম অপব্যবহার তো অনিবার্যভাবে হবেই। তবে পরবর্তীকালে প্রায় সকল প্রযোজনা-চারিত্র্যে তা গভীর ছাপ ফেলেছে একথা বলতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাঁর 'বেহুলার ভাসান'—আরেক মর্যাদাসম্পন্ন প্রযোজনা। সবশেষে নানাদলের নবীন অভিনেত্রী সহযোগে 'রিজওয়ান' বিপুল সাড়া জাগায়—যার মধ্যে ক্যারিসমার অতিরেক লক্ষ্য করেন অনেকে। এটা অবশ্য তাঁর স্বভাবের এক বিশিষ্ট মুদ্রাদোষ বটে।—সেখানেই তাঁর শক্তি আর দুর্বলতা।

নাট্যকর্মশালা ও শিক্ষকতা এবং বর্তমানকার নাট্যবিষয়ক বাচন-ভাষ্য বৈঠকেও তাঁর ধীমান আতীব্র প্রখরতা নবীন নাট্যজনকে উদ্বেলিত করে। নানা দেশে তাঁর নাট্য নির্দেশনা, শিক্ষকতা ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণা-লেখন তাঁকে মর্যাদার আসনে বৃত করেছে। সেলিন আল দীন মধ্যযুগের বাংলা নাটকের একার্থে উদ্ধার-আবিষ্কার করলেও তা ছিল তাত্ত্বিক, পুঁথিগত। আর জামিল আহমেদ দেশজুড়ে বর্তমানে জীবন্ত ক্রিয়াশীল তাবৎ বিচিত্র বাংলানাট্য রূপ-রীতি-প্রকরণের শ্রেণীকরণ চিহ্নিত করেছেন মাঠ-পর্যায়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, দর্শন-মনন-গবেষণায়—তাঁর 'অচিনপাখি' বাংলা নাটকের জীবন্ত রূপ-রীতি-ভাব-ভাষের আকর-গ্রন্থ। পরবর্তীকালে ইসলামের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক বিষয়ে, মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলা অঞ্চলে চর্চিত নানা নাটকের সুলুকসন্ধান করেছেন। নাটক বিষয়ে জনমনের ভুল ব্যাখ্যা অপনোদনের দায়বদ্ধ জিজ্ঞাসায়।

সবমিলে বলতে হয়, সেলিম আল-দীন আর জামিল আহমেদ—রচনা-প্রকরণ ও নির্দেশনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের থিয়েটারে পরবর্তী নাট্যজনের চেতন-অবচেতনে গভীর, স্থায়ী চেতাবনি সঞ্চার করেছে। তার মধ্যকার তাবৎ অক্ষম অনুকায়ী অপব্যবহারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও তার জীবন্ত উদ্বেজন অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের নাট্যের চারিত্র্য নির্মাণে এই দুই মহাজনের অর্জন ইতিহাসের অংশবটে।---যদিও রচনা-নির্দেশনা-অভিনয়ে অন্য নানা প্রতিভার বিচিত্র অভিভাব নিশ্চয় বাংলাদেশের নাট্য মানচিত্র নির্মাণ করেছে।—আলী যাকের, আতাউর রহমান, ফেরদৌসী মজুমদার, আসাদুজ্জমান নূর, আবুল হায়াৎ, হুমায়ুন ফরিদী, রাইসুল ইসলাম আসাদ, শিমূল ইউসুফ এবং প্রয়াত খালেদ খান ও এস এম সোলায়মান বাংলাদেশের থিয়েটারে নির্দেশনা-অভিনয়ে কিংবদন্তীতুল্য।

নাট্য একটি যৌথ শিল্প-নন্দন কলা-মাধ্যম বটে। বাংলা নাট্যজনের এ এক সমবেত অর্জন নিশ্চয়।—যেমন 'নাট্যজন' অভিধাটি সৈয়দ শামসুল হকের উদ্‌ভাবন—নাট্যপাগল, নাট্যোৎসাহী বা নাট্যকর্মীর ব্যক্তিসত্তার হিত দশা থেকে এক সমর্থ উত্তরণের সাক্ষ্য।